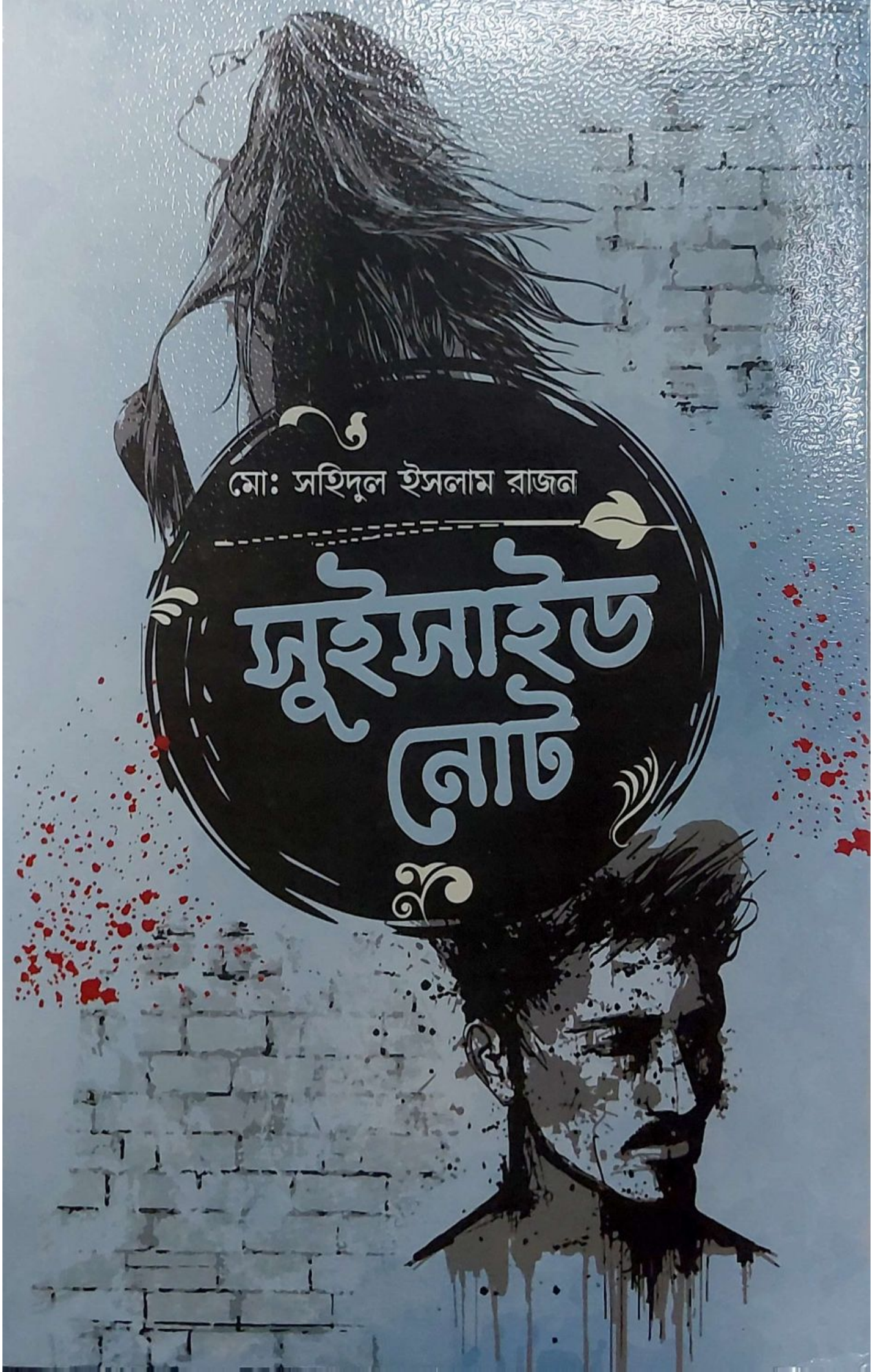
মোঃ সহিদুল ইসলাম রাজন
সুইসাইড নোট

পারিবারিক ভাঙ্গন, মা-বাবার মাঝে দ্বন্দ্ব, বিচ্ছেদ যে কোনো সন্তানের সুস্থ মানসিক বিকাশের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রাবনও তেমন, বাবা মায়ের বিচ্ছেদ তাকে একঝাঁক একাকীত্ব, অস্তিত্বহীনতা এবং হতাশার মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। তার অন্ধকার জীবনে হঠাৎ এক টুকরো আলো হয়ে আসে নীলা, অল্প অল্প করে জমতে থাকে তাদের ভালোবাসা এবং ঘর বাঁধার স্বপ্ন। সে নীলাই যখন নিভু নিভু করে ডুবে যেতে চায় ঠিক তখনই শ্রাবন ফিরে যায় তার পুরনো একাকীত্বে। অবহেলা নামক ফিনিক্স পাখি তাকে করে তোলে ভয়ানক, প্রচণ্ড ভয়ানক।

রোমান্টিক থ্রিলার সুইসাইড নোট শ্রাবন এবং চারদেয়ালের মাঝে আটকে থাকা অসহায় এক মায়ের গল্প। সুইসাইড নোট ঝুমুর নামক এক প্রাণবন্ত কিশোরীর গল্প। সুইসাইড নোট আমি এবং আমাদের গল্প।

প্রচ্ছদঃ আদনান আহমেদ রিজন

সুইসাইড নোট

মোঃ সহিদুল ইসলাম রাজন

বইবাজার

ভূমিকা

আমি মূলত কবিতার মানুষ, একদিন মাথার ভিতরে হঠাৎ ভিড় করে একটি প্রেমের গল্প, নিজের মতো করে সাজানো শুরু করলাম, নামও দিয়েছিলাম ভালোবাসার আরেকটি গোধূলি। কিন্তু প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা এবং সাবলীল উপস্থাপনা করার মতো সাহস ছিল না বলে উপন্যাসটি লেখার মতো দুঃসাধ্য কাজটি করতে পারিনি আর। তাই পরীক্ষামূলকভাবে নিজের দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে তোলার জন্য লেখা শুরু করি আরেকটি কাহিনি; লিখতে লিখতে মন বসে যায় কাহিনিতে এবং সেই পরীক্ষিত কাহিনিটি আজকের 'সুইসাইড নোট।'

সুইসাইড নোট তথাকথিত রোমান্টিক থ্রিলারের থ্রিল দিতে না পারলেও হয়তো পাঠকের ভাবনায় দাঁড় করাতে পারবে এমন একটি বাক্য– 'এমনও জীবন হয়! এমনও কিছু অসহায় মানুষ হয়!' এবং কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস।

সুইসাইড নোট লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝে দু'তিন লাইন লেখার পর থেমে যেতাম, লিখতে পারতাম না, মনে হতো কিছু চরিত্রকে বেশি কষ্ট দিচ্ছি। তাই পুরো কাহিনি সাজানোর পরেও লেখা শেষ করতে দু'বছর সময় লেগে যায়। তবে ঝুমুর চরিত্রটি লিখতে আমি খুব সাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম। খুব ভালোলাগার চরিত্র হলো ঝুমুর।

বলে রাখা ভালো, শ্রাবণ নামটি ইচ্ছে করেই শ্রাবন লেখা হয়েছে, এটা বোঝানোর জন্য যে শ্রাবণ চরিত্রটি তার নামের মতো অনেককিছু থেকে বঞ্চিত। ভুলভাবে উপস্থাপিত; কিছু মানুষের কাছে। শ্রাবণ তার নামের মতোই অস্তিত্বহীনতায় ডুবে যাওয়া একজন মানুষ। তার নামের মতোই

তার ডাইরির প্রতিটি তারিখ লেখার ভঙ্গি, তার মানসিক অবস্থা প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত।

প্রকাশক সাহেবের কথা না বললেই নয়। উনি এ বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছেন। এরকম লেখকবান্ধব প্রকাশক আমরা নতুন লেখকেরা খুব করে চাই।

সবকিছুর পরেও কিছু ভুল থেকে যাবে, কিছু জিনিস অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে অনেকের কাছে তবুও চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব সাবলীলতা এবং প্রাসঙ্গিকতা রাখার। জানি না কতটুকু পেরেছি তবে ইনশাআল্লাহ ভুলগুলো আস্তে আস্তে কাটিয়ে তুলতে পারব কোনো একদিন– আমার পরের কোনো উপন্যাসে।

মোঃ সহিদুল ইসলাম রাজন

মাঝারি আকৃতির আবদ্ধ রুমে তখনো বেজে চলছে হাঙ্গেরিয়ান সুইসাইড সং– দ্য গ্লুমি সানডে। ভেসে আসছে কিছু লাইন, যেগুলোর ভাবার্থ ছিল এমন–

'প্রিয়তমা আমি চাই
আমার স্বপ্নরা তোমাকে আর জেঁকে না বসুক,
এ হৃদয় তোমাকে বলে যাচ্ছে আজ
ঠিক কতটা চেয়েছিলাম তোমায়....।'

ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করে পুলিশ। শুরুতে হাল্কা আলো বাকিটা আবছা অন্ধকার। মেঝেতে রক্তের ফোয়ারা, সাথে ছোট ছোট মাংসের টুকরো, টেবিলে বৃহৎ। হাত-পা-মাথা, চোখ। টুকরো টুকরো করে সাজানো সব। যেন সাজিয়ে রাখা হয়েছে কোনো প্রদর্শনীর জন্য। কাটা অংশগুলো দেখে বোঝার উপায় নেই অংশগুলো ঠিক কার শরীরের।

নিচে পড়ে আছে 'উদারিং হাইটস, ট্রাজেডি প্লাস টাইম, 'মাই ফাদার বিফোর মি', 'বাই দ্য টাইম ইউ রিড দিজ আই উইল বি ডেইড', 'আই ওয়াজ হেয়ার', কাভারে লেগে আছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। আরো পড়ে আছে কয়েকটি ব্যর্থ আঙুল। সিলিঙে ঝুলে আছে রশি, অন্য ফ্যানের বাতাসে ঝুলছে ধীরগতিতে। মেঝে এবং টেবিল ছাড়াও বইয়ের তাক, দেয়াল, চেয়ার সবকিছুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রক্তের দাগ, কোথাও এঁকে আছে মানুষ, কোথাও এঁকে আছে বিরহ, কোথাও এঁকে আছে প্রেম।

নীলা বাঁধা পড়ে আছে চেয়ারে, অজ্ঞান অবস্থায়। নীলার মাথা নেতিয়ে পড়ার ধরন, তার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত কোনো ঘুম ঘুমিয়েছে সে। সে তখনও জানে না শ্রাবন কোথায়, কেমন আছে, বেঁচে আছে না-কি মরে গেছে। শ্রাবন তার প্রেমিকের নাম, যে তাকে ভয়ানকভাবে ভালোবাসতো। নীলা তার ভালোবাসা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি কখনোই। তার কিছু চুল কপাল বেয়ে চোখ ছুঁয়ে এমনভাবে পড়েছিল ঠিক যেমনটা শ্রাবন চাইতো, যখন তাদের সম্পর্ক ভালো ছিল, তখন এভাবে চুল পড়া দেখলে সে নীলার সামনে বসে নীলার হাঁটুতে হাতের ভর দিয়ে নীলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতো আর বলতো,

'আমাকে কখনো ছেড়ে যেও না প্লিজ।'

বলেই নীলার কোলে মাথা রেখে বসে থাকতো, নীলা তখন শ্রাবনের মাথা সোজা করে তুলে ধরে চোখে চোখ রেখে বলতো,

'আমি চলে গেলে আমার পাগলটা কার কোলে এভাবে মাথা রাখবে?' এবং শ্রাবনের দিকে তাকিয়ে হাসতো, ভালোবাসার হাসি। বিয়ের পর চোখের উপর চুল পড়ার দৃশ্য দেখার মতো কখনও কোনো আবদার করেনি শ্রাবন, তখন নীলা ইচ্ছে করে চোখের উপর চুল ফেলে রাখলেও ফিরে তাকাতো না সে।

নীলার সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে তার পুরোটা জুড়ে ছিল নীলা, নীলা আর শ্রাবনের পরিচয় ভার্সিটি জীবনে, দু'বছরের জুনিয়র ছিল নীলা। আন্তঃ বিভাগীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় গ্রিক চরিত্র হেক্টর আর একিলিসকে নিয়ে কথা বাড়াতে গিয়ে তাদের বাড়তি পরিচয়। প্রতিযোগিতার টপিক ছিল 'ইলিয়াড মহাকাব্যে কাকে বেশি পছন্দ এবং কেন?'

নীলা একিলিস আর শ্রাবন হেক্টরের পক্ষ নিয়ে লড়েছিল। প্রথমদিকে অনেক এগিয়ে থাকলেও পরে চুপসে গেল শ্রাবন কারণ, তখন তার পুরো মনোযোগ ছিল নীলার চোখ বেয়ে চুল পড়ার উপর। নীলার কণ্ঠের উপর, নীলার হাসি এবং নীলার খোলা চুলের উপর। চুপসে যাওয়ার পর বিতর্কে হেরে গেলেও পরে লাভই হয়েছিল শ্রাবনের কারণ, তার হঠাৎ চুপসে পড়া নজরে পড়েছিল নীলার। তাইতো বিতর্ক শেষে নীলা শ্রাবনকে বলে উঠল,

'আপনি এভাবে থেমে গেলেন কেন ভাইয়া?' কিছুটা নিচের দিকে তাকিয়ে শ্রাবন উত্তর দিল,

'এমনি, কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

পেছন থেকে শ্রাবনের বন্ধুরা হাসতে হাসতে কী যেন বলতে চাইলো। নীলার সেটা বুঝতে বাকি রইল না, সে লজ্জায় পড়ে গেল, শ্রাবনও। তাই শ্রাবন বলল,

'আচ্ছা আমি আসি।'

'আমিও।'

বলেই দু'জন দু'দিকে চলে গেল, পেছন ফিরে তাকাতে গিয়েও কেউ তাকায়নি। ডিপার্টমেন্টে জুনিয়র মেয়েদের মাঝে এমনিতেও শ্রাবন সম্বন্ধে অনেক ভালো ধারণা। সে অনেক ভদ্র, হাসিখুশি আর শান্ত স্বভাবের, কয়েকজন জুনিয়র ওকে অনেক পছন্দও করে, সেসব জুনিয়রের একজন হলো নীলা। চোখের উপর চুল পড়া ছাড়াও নীলার প্রতি শ্রাবনের আরও কিছু আবদার ছিল।

শ্রাবন ছিল অনেক গোছালো স্বভাবের, তবে যখন থেকে নীলার সাথে পরিচয়, তখন থেকে অগোছালো হয়ে গেল, সে চাইতো নীলা তাকে বকাঝকা করে গুছিয়ে নিবে, আর তাই সে ইচ্ছে করেই অগোছালো হয়ে থাকতো। শ্রাবন বলতো,

'কেবল তুমি গুছিয়ে দিবে বলে
আমি অগোছালো হয়ে যাব আবার,
তুমি নিয়ম করে শাসন করবে বলে
আমি অনিয়ম করবো বারবার।'

নীলাও শ্রাবনকে নিজের মতো করে গুছিয়ে নিতে লাগলো, নীলার প্রতি শ্রাবনের আরো একটি আবদার হলো, নীলা যেন তার সাথে অনেক ঝগড়া করে, রাগ কিংবা অভিমান করে। তাই সে মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করেই নীলার অবাধ্য হতো, নীলাকে ক্ষেপাতো, ঝগড়ার এক পর্যায়ে নীলা যখন কান্না শুরু করতো তখন শ্রাবন পিছন থেকে নীলাকে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতো,

'সরি, ইচ্ছে করে রাগানোর জন্য।'

এতে নীলার রাগ না কমে বরং বেড়ে যেত, আর বলতো,

'এরকম ঝগড়া করলে আমি সত্যিই একদিন দূরে চলে যাব।'

নীলা দূরে চলেও গিয়েছিল। তবে দূরে গিয়েছিল শ্রাবনের অতিরিক্ত অধিকার দেখানোর কারণে। অতিরিক্ত অধিকার দেখানোটা একসময় নীলার মনে তার জন্য বিরক্তির জন্ম দেওয়া শুরু করে, আর সে বিরক্তি থেকে বাঁচতেই তৃতীয় ব্যক্তির উদয়। তৃতীয় ব্যক্তিটি আসাতে নীলা অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঝুঁকে পড়ে তার উপর আর শ্রাবন– তার পুরনো একাকিত্বের।

শ্রাবনের একাকিত্ব ছিল ছোটবেলা থেকে। তার বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, সারাদিন বাহিরে বাহিরে থাকতেন, বউ আর ছেলেকে তেমন সময় দিতেন না তিনি। শ্রাবনের বাবা মায়ের মাঝেও তেমন ভালো সম্পর্ক ছিল না তখন, সম্পর্ক ভালো না থাকার পিছনে প্রধান কারণ এক পরনারীর উপর লোভ ছিল শ্রাবনের বাবার। টাকার কারণে পরনারীকেও হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেন তিনি। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রী দু'জনের মাঝে ঝগড়া হতো প্রায়, অনেক মারধরও করতেন শ্রাবনের মা'কে। রাতে যখন ঘুম ভেঙে গিয়ে মারধরের শব্দ কানে আসতো শ্রাবনের, তখন সে বিষয়টা মেনে নিতে পারতো না। শ্রাবনের মা যখন একা একটি রুমে এসে কান্না করতেন সে তখন আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাকে দেখতো, কখনো কাছে যেতো না মায়ের। বাবাকেও ভয়ে কিছু বলতে পারতো না কখনও। যখন পরনারীর উপর বাবার লোভ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারল তখন থেকে বাবার উপর ঘৃণা জন্মালো তার, একটু ঘৃণা জন্মেছিল মায়ের উপরও, ঠিক তখন– যখন তিনি দ্বিতীয় বিয়েতে মত দিলেন। মত দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না মায়ের।

শ্রাবনের মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল ছাড়াছাড়ি হওয়ার কয়েকমাস পর শ্রাবন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাবা মায়ের ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগ পর্যন্ত সে তার বাবা মায়ের রুম থেকে সবচেয়ে দূরের রুমে থাকার চেষ্টা করতো, যেন মায়ের কান্নার আওয়াজ তার কানে আর না আসে, সবকিছুর পরেও প্রায় প্রতিদিন ঘুম ভেঙে যেত তার, প্রতিদিন মায়ের রুমের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হতো অনেকক্ষণ, এ যেন এক নিত্যদিনের অভ্যাস, এ যেন এক না-বলা দায়িত্ব। শ্রাবনের মা আরও আগেই ভাইদের কাছে চলে যেতেন যদি শ্রাবন না থাকতো, শ্রাবনের কথা ভেবেই তিনি যন্ত্রণা বয়ে এসেছিলেন, মায়ের কষ্ট শ্রাবন বুঝতো, শুধু মুখ ফুটে মাকে কিছু বলতো